হেমেন্দ্রকুমার রায়

কল্পবিজ্ঞান রচনাসমগ্র ১

সম্পাদনা ও টীকা : প্রদোষ ভট্টাচার্য্য

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

মেঘদূতের মর্তে আগমন	৯
ময়নামতীর মায়াকানন	৬৭
নীল সায়রের অচিনপুরে	১২৮
হিমালয়ের ভয়ংকর	১৯৯
অসম্ভবের দেশে	২৪৮
মান্ধাতার মুল্লুকে	৩০৭
গুহাবাসী বিভীষণ	৩৭২
বনের ভেতরে নতুন ভয়	৩৮০
পিশাচ	৩৯১

শ্রাবণ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রচ্ছদ

মেঘদূতের মর্তে আগমন

এক

অলৌকিক রহস্য

সেদিন সকালবেলায় কমল যখন নিজের পড়বার ঘরে সবে এসে বসেছে, হঠাৎ তার চাকর ঘরে ঢুকে খবর দিলে, বাবু, একটা লোক আপনাকে এই চিঠিখানা দিয়ে গেল। কমল চিঠিখানা খুলে পড়লে, তাতে শুধু লেখা আছে—

> প্রিয় কমল,
> শীঘ্র আমার বাড়িতে এসো। সাক্ষাতে সমস্ত বলব।
> ইতি—
> বিনয় মজুমদার।

বিনয়বাবুর সঙ্গে কমলের আলাপ হয় মধুপুরে বেড়াতে গিয়ে। কমলের বয়স উনিশ বৎসর, সে কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র। বিনয়বাবুর বয়স পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু বয়সে এতখানি তফাত হলেও, দুজনের মধ্যে আলাপ খুব জমে উঠেছিল। বিনয়বাবুর স্বভাবটা ছিল এমন সরল যে, বয়সের তফাতের জন্যে কারও সঙ্গে তার ব্যবহারের কিছুমাত্র তফাত হত না।

কমলের সঙ্গে বিনয়বাবুর আলাপ এত ঘনিষ্ঠ হবার আরও একটা কারণ ছিল। বিনয়বাবু সরল হলেও তার প্রকৃতি ঠিক সাধারণ লোকের মতন নয়। দিনরাত তিনি পুথিপত্র আর লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকেন, সংসারের আর কোনো ধার বড়ো একটা ধারেন না। তাঁর বাড়ির ছাদের উপরে আকাশ-পরিদর্শনের নানারকম দূরবিন ও যন্ত্র আছে, গ্রহনক্ষত্রের খবর রাখা তাঁর একটা মস্ত বাতিক। এ সম্বন্ধে তিনি এমন সব আশ্চর্য গল্প বলতেন, তার অন্যান্য বন্ধুরা যা গাঁজাখুরি বলে হেসেই উড়িয়ে দিতেন, এমনকি অনেকে তাকে পাগল বলতেও ছাড়তেন না।

কমল কিন্তু তার কথা খুব মন দিয়ে শুনত। কমলের মতো শ্রোতাকে পেয়ে বিনয়বাবুও ভারী খুশি হয়েছিলেন এবং এইজন্যেই কমলকে তার ভারী ভালো লাগত। নিজের নতুন নতুন। জ্ঞানের কথা কমলের কাছে তিনি খুলে বলতেন, কমলও তা ধ্রুবসত্য বলে মেনে নিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করত না।

তৃতীয় ঘটনাটিও কম আশ্চর্যের নয়। বিলাসপুর স্টেশনে একখানা রেলগাড়ির ইঞ্জিন লাইনের উপর দাঁড় করানো ছিল। গত ১৩ কার্তিক তারিখে রাত্রি বারোটার সময় স্টেশনমাস্টার স্বয়ং ইঞ্জিনখানাকে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু রাত্রি একটার পর থেকে ইঞ্জিনখানাকে আর পাওয়া যাইতেছে না। ইঞ্জিনে আগুন ছিল না, সুতরাং তাহাকে চালাইয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব। তার উপরে সমস্ত লাইন তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ইঞ্জিনের কোনো সন্ধান মিলে নাই।

এসব কোনো বদমাশ বা চোরের দলের কাজ হইতে পারে না। তাহা হইলে পূর্বোক্ত স্টিমার বা বট গাছ বা ইঞ্জিনের কোনো না কোনো খোঁজ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত। অত বড়ো একটা বট গাছ শিকড়সুদ্ধ উপড়াইয়া ফেলিতে যে কত লোকের দরকার, তা আর বুঝাইয়া বলিবার দরকার নাই—মোট কথা, সেটা একেবারে অসম্ভব। এসব কাজ এতটা চুপিচুপি, এত শীঘ্র করাও চলে না। অথচ এমনি সব কাণ্ড ঘটিতেছে। এর কারণ কী?

বিলাসপুরের বাসিন্দারা এইসব অলৌকিক ব্যাপারে যে যারপরনাই ভয় পাইয়াছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। সন্ধ্যার পর গ্রামের কেউ আর বার হয় না। চৌকিদারও পাহারা দিতে চাহিতেছে না। সকলেই বলিতেছে, এসব দৈত্যদানবের কাজ। রাত্রে অনেকেই নাকি একরকম অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পায়—সে শব্দ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়। কোনো কোনো সাহসী লোক জানলায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুই দেখিতে পায় নাই। তবে তাহারা সকলেই এক আশ্চর্য কথা বলিয়াছে—শব্দটা যখন খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠে, তখন চারদিকে নাকি বরফের মতো কনকনে ঠান্ডা বাতাস বহিতে থাকে। এ শব্দ কীসের? এবং এ ঠান্ডা বাতাসের গুপ্ত রহস্যই বা কী?

আমরা অনেকরকম আশ্চর্য ঘটনার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এমন ব্যাপার আর কখনও শুনি নাই। এ ঘটনাগুলি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, সে বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা স্বয়ং ঘটনাস্থলে গিয়া সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। যাঁহাদের বিশ্বাস হইবে না, তাঁহারাও নিজেরা দেখিয়া আসিতে পারেন।

দুই
শব্দ ও ঠান্ডা বাতাস

খবরের কাগজখানা টেবিলের উপরে রেখে কমল খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বিনয়বাবু তার মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, সমস্ত পড়লে তো?

কমল বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কী বুঝলে?

ঘটনাগুলো যদি সত্যি হয়, তাহলে এসব ভূতুড়ে ব্যাপার বলে মানতে হবে বই-কি।

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, প্রথমত, আমি ভূত মানি না। দ্বিতীয়ত, ভূতে যে একদল খালাসি সমেত স্টিমার, ইঞ্জিন আর একদল বানরসুদ্ধ বট গাছ একেবারে বেমালুম হজম করে ফেলতে পারে এমন গল্প কখনও গাঁজাখোরের মুখেও শোনা যায় না।

কমল বললে, তবে কি এ সমস্ত আপনি মানুষের কাজ বলে মনে করেন?

বিনয়বাবু বললেন, মানুষ! মানুষের সাধ্য নেই যে ঘাসের গোছার মতো দেড়শো বছরের বট গাছ উপড়ে ফেলবে, খেলার পুতুলের মতন স্টিমার বা ইঞ্জিন তুলে নিয়ে যাবে! বিশেষ, তাহলে ওই বট গাছ, স্টিমার বা ইঞ্জিনের কোনো না কোনো খোঁজ নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। এই ইংরেজ রাজত্বে একখানা ছোটো গয়না কেউ চুরি করে লুকিয়ে রাখতে পারে না, আর অত বড়ো বড়ো মালের যে কোনো পাত্তাই মিলছে না, তা-ও কি কখনও সম্ভব হয়? স্টিমারের খালাসিরা আর গাছের বানরগুলোই বা কোথায় যাবে? তারপর, এই শব্দ আর ঠান্ডা বাতাস। এরই বা হদিস কী? কেন শব্দ হয়, কেন ঠান্ডা বাতাস বয়?

কমল বললে, তাহলে আপনি কী মনে করেন? এসব যদি ভুত বা মানুষের কাজ না হয়—

বিনয়বাবু বাধা দিয়ে বললেন, কমল, ভুত কি মানুষের কথা—এ সম্পর্কে একেবারে ভুলে যাও! এ এক এমন অজ্ঞাত শক্তির কাজ, আমাদের পৃথিবীতে যার তুলনা নেই। সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা যে শক্তির সন্ধানের জন্যে এতকাল ধরে চেষ্টা করছেন, আমাদের বাংলা দেশেই তার প্রথম লীলা প্রকাশ পেয়েছে। কমল, তুমি জানো না, আমার মনে কী আনন্দ হচ্ছে!

কমল কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চুপ করে থেকে বললে, বিনয়বাবু, আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কী বলতে চান?

বিনয়বাবু কয় পা এগিয়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললেন, কমল, আজ বৈকালেই আমি বিলাসপুরে রওনা হব। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে?

কমল বললে, আমরা সেখানে গিয়ে কী করব?

বিনয়বাবু বললেন, ভয় পেয়ো না। ভয় পেলে মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের মর্যাদা রাখতে পারে না। বিলাসপুরে যেসব ঘটনা ঘটছে তা এক আশ্চর্য আবিষ্কারের সূচনামাত্র! শীঘ্রই এর চেয়ে বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটবে, আর তা ঘটবার আগেই আমি ঘটনাক্ষেত্রে হাজির থাকতে চাই।

কমল বললে, বিনয়বাবু, আমি ভয় পাইনি। আমি খালি বলতে চাই যে, পুলিশ যেখানে বিফল হয়েছে, আমরা সেখানে গিয়ে কী করব?

বিনয়বাবু বললে, পুলিশ তো বিফল হবেই, এ রহস্যের কিনারা করবার সাধ্য তো পুলিশের নেই। বাংলা দেশে এখন একমাত্র আমিই এ ব্যাপারের গুপ্ত কথা জানি। আমার এতদিনের আলোচনা কি ব্যর্থ হতে পারে? এখন আমার প্রশ্নের জবাব দাও। আমার সঙ্গে আজ কি তুমি বিলাসপুরে যাবে?

কমল বললে, যাব।

তিন

নতুন পরিচয়

বিনয়বাবু আর কমল যখন বিলাসপুরে গিয়ে হাজির হলেন, তখন বিকালবেলা।

বিনয়বাবু বললেন, কমল, এখানে আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে। তার বাড়িতে গিয়ে উঠলে পরে তিনি আমাদের খুব আদরযত্ন করবেন বটে, কিন্তু কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ গিয়ে পড়লে তাঁর অসুবিধে হতে পারে।

কমল বললে, কিন্তু সেখানে না গিয়েও তো উপায় নেই। রাত্রে একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই তো দরকার?

বিনয়বাবু হেসে বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়! আমরা কি আর মাঠে শুয়ে রাত কাটাব? এখানে ডাকবাংলো আছে; সেখানে আজকের রাত কাটাতে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?

কমল বললে, কিছু না। বরং অচেনা লোকের বাড়ির চেয়ে ডাকবাংলোই ভালো।

স্টেশনের কাছেই ডাকবাংলো। দুজনে ডাকবাংলোর হাতার ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই সেখানকার চাকর এসে তাদের সেলাম করলে।

বিনয়বাবু বললেন, এ বাংলো কি তোমার জিম্মায় আছে?

সে বললে, হ্যাঁ, কর্তাবাবু।

তোমার নাম কী?

আজ্ঞে, অছিমুদ্দি।

দ্যাখো অছিমুদ্দি, আজ আমরা এখানে থাকব। এই ব্যাগটা তোমার কাছে রাখো, আর আমাদের দুজনের জন্যে রাত্রের খাবারের ব্যবস্থা করো—মুরগির ঝোল চাই, বুঝলে? এই নাও টাকা। আমরা ততক্ষণে একটু ঘুরে আসি।

বিনয়বাবু কমলের হাত ধরে বাংলোর হাতা থেকে আবার বেরিয়ে পড়লেন।

কমল বললে, আমরা কোথায় যাচ্ছি, বিনয়বাবু?

বিনয়বাবু বললেন, শীতলার মন্দিরে। বট গাছের ব্যাপারটা সত্যি কি না, আগে দেখে আসা দরকার।

বিনয়বাবু বিলাসপুরে আগেও বারকয়েক এসেছিলেন, কাজেই পথঘাট তাঁর জানা ছিল। মিনিট পাঁচেক পরেই তাঁরা শীতলার মন্দিরের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বিনয়বাবু বললেন, কমল, সত্যিই তো বট গাছটা নেই দেখছি! সে গাছটা আগেও আমি দেখেছি—প্রকাণ্ড গাছ। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিখ্যাত বট গাছ দেখেছ তো? এ গাছটি তার চেয়ে কিছু ছোটো হলেও এত বড়ো গাছ বাংলা দেশে আর কোথাও দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। অথচ দ্যাখো, সেই গাছের বদলে এখন শুধু একটা গর্ত রয়েছে।

কমল অবাক হয়ে দেখলে, তার সামনে মস্ত বড়ো একটা গর্ত—তার ভিতরে অনায়াসে শতাধিক মানুষকে কবর দেওয়া যায়। বট গাছটা যে কত বড়ো ছিল, কমল এতক্ষণে তা আন্দাজ করতে পারলে। অথচ এত বড়ো একটা গাছকেই সকলের অজান্তে রাতারাতি উড়িয়ে নিয়ে গেছে! মানুষের পক্ষে এমন কাজ অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব!

মন্দিরের ভিতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল।

বিনয়বাবু এগিয়ে গিয়ে তাকে একটি প্রণাম করে বললেন, আপনি বোধহয় এই শীতলাদেবীর সেবাইত?

হ্যাঁ, বাবা।

এখানে নানারকম আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা হচ্ছে শুনে আমরা কলকাতা থেকে দেখতে এসেছি। আচ্ছা, যেরাতে বট গাছটি অদৃশ্য হয়, সেরাতে আপনি কোথায় ছিলেন?

এই মন্দিরের পাশেই আমার ঘর। আমি এইখানেই ছিলুম।

অথচ কিছুই টের পাননি?

টের যে ঠিক পাইনি, তা নয়; তবে আসল ব্যাপারটা তখন বুঝতে পারিনি।

কীরকম?

অনেক রাতে হঠাৎ কীরকম একটা শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তার পরেই ঝড়ে গাছ দোলার মতো আওয়াজ শুনলুম, সঙ্গে সঙ্গে একটা কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা জানলা দিয়ে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল, আর বট গাছের বাঁদরগুলো কাতরে চ্যাঁচাতে লাগল। ঝড় উঠেছে ভেবে তাড়াতাড়ি আমি জানলা বন্ধ করে দিলুম—তার পরেই সব চুপচাপ। সকালে উঠে দেখি, বট গাছটা আর নেই।

তাহলে আপনি কি মনে করেন যে, ঝড় এসেই বট গাছটিকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে?

না, না, তা কী করে হবে? এত বড়ো বট গাছ উড়িয়ে নিয়ে যাবে, এমন প্রচণ্ড ঝড় উঠলে গাঁয়ের ভিতরে নিশ্চয়ই আরও অনেক গাছপালা তছনছ হত, অনেক ঘরবাড়ি পড়ে যেত। কিন্তু আর কোথাও কিছু হল না, উড়ে গেল শুধু এই বট গাছটা?

তাহলে আপনি কি বলতে চান যে—

লোকটি বাধা দিয়ে বললে, আমি আর কিছু বলতে চাই না বাবা, এসব কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতেও আমার ভয় হয়, বলতে বলতে সে আবার মন্দিরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিনয়বাবু ফিরে বললেন, চলো কমল, আমরা একবার গাঁয়ের ভিতরটা ঘুরে আসি।

দুজনে আবার অগ্রসর হলেন। বিলাসপুর গ্রামখানি বেশ বড়ো—তাকে শহর বললেও চলে। পথে পথে ঘুরে নানা লোককে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেও বিনয়বাবু আর কোনো নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে পারলেন না। তবে এটুকু বেশ বোঝা গেল, খবরের কাগজের কোনো কথাই মিথ্যা নয়।

সন্ধ্যার মুখে তাঁরা যখন আবার ডাকবাংলোর দিকে ফিরলেন, তখন বিনয়বাবু লক্ষ করলেন যে, গ্রামখানি এর মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। পথে আর মানুষ নেই, অধিকাংশ ঘরবাড়িরই দরজা-জানলা বন্ধ। এখানকার বাসিন্দারা যে খুব বেশি ভয় পেয়েছে, তাতে আর কোনোই সন্দেহ নেই।

বাংলোর বারান্দায় উঠে বিনয়বাবু দেখলেন, সেখানে দুটি যুবক দুখানা চেয়ারের উপর বসে আছে। তার মধ্যে একটি যুবকের দেহ যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, দেখলেই বুঝতে দেরি লাগে না যে, তার দেহে অসুরের মতন ক্ষমতা।

তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সেই লম্বাচওড়া যুবকটি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন করে বললে, আজ বৈকালে আপনারাই কি এসেছেন?

হ্যাঁ।

তাহলে আমরাও আজ এখানে আপনাদের সঙ্গী হতে চাই। আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?

না, না, আপত্তি আবার কীসের? বেশ তো, একসঙ্গে সবাই মিলে থাকা যাবে। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

কলকাতা থেকে। খবরের কাগজে একটা ব্যাপার পড়ে দেখতে এসেছি।

ও, তাহলে আপনারও আমাদেরই দলে? আমরাও ওই উদ্দেশে এখানে এসেছি। আপনাদের নাম জানতে পারি কি?

আমার নাম শ্রীবিমলচন্দ্র রায়, আর আমার বন্ধুটির নাম শ্রীকুমারনাথ সেন।

বিনয়বাবু বললেন, বিমলবাবু, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তো?

বিমল বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার চাকর রামহরিকে বাজারে পাঠিয়েছি, ওই যে, সে ফিরছে। চাঙারি হাতে করে একটি লোক বাগান থেকে বারান্দায় এসে উঠল, তার সঙ্গে এল ল্যাজ নাড়তে নাড়তে প্রকাণ্ড একটা কুকুর।

বিনয়বাবু বললেন, ও কুকুরটা কার? কামড়াবে না তো?

কুমার বললে, না, না, কামড়াবে না, বাঘা বড়ো ভালো কুকুর।

কমল এতক্ষণ চুপ করে কথাবার্তা শুনছিল। এখন সে বললে, বিমলবাবু, আপনাদের নাম আর ওই কুকুরের নাম শুনে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।

বিমল বললে, কী কথা?

কমল একটু ইতস্তত করে বললে, 'যকের ধন' বলে আমি একটা উপন্যাস পড়েছিলুম, তাতেও বিমল, কুমার, রামহরি আর বাঘা কুকুরের নাম আছে। কী আশ্চর্য মিল!

বিমল একবার কুমারের মুখের দিকে চেয়ে মুখ হেসে বললে, মিল দেখে আশ্চর্য হবেন না। আমরা সেই লোকই বটে।

বিস্ময়ে হতভম্বের মতো কমল হাঁ করে খানিকক্ষণ বিমলের মুখের পানে তাকিয়ে রইল; তারপর বলে উঠল, তা-ও কি সম্ভব?

বিমল তেমনি হাসিমুখে বললে, সম্ভব নয় কেন?

কমল বললে, তারা হচ্ছে উপন্যাসের লোক, আর আপনারা যে সত্যিকারের মানুষ!

বিমল বললে, যকের ধন যে সত্যিকারের ঘটনা; তা মিথ্যা বলে ভাবছেন কেন?

সত্যি ঘটনা! তাহলে আপনারা কি সত্যি সত্যিই খাসিয়া পাহাড়ের বৌদ্ধ মঠে গিয়েছিলেন?

নিশ্চয়! কিন্তু সে আজ পাঁচ-ছয় বছর আগেকার কথা, সেসব বিপদের কথা এখন আমাদের কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয়!

চার

পুকুর চুরি

খাওয়াদাওয়ার পর বিনয়বাবু 'যকের ধন'-এর গল্পটি বিমলের মুখ থেকে আগাগোড়া শ্রবণ

এক-এক লাফে আমরা খাল পার হয়ে গেলুম। আমাদের দেখাদেখি বাঘাও লাফিয়ে খাল পার হল—মঙ্গলে এসে তারও লাফ মারবার ক্ষমতা আশ্চর্যরকম বেড়ে গেছে।

বারবার লাফ মেরে অগ্রসর হলে পাছে হাঁপিয়ে পড়ি, সেই ভয়ে আমরা পায়ে হেঁটেই এগুতে লাগলুম। আর বেশি তাড়া করবারই বা দরকার কী, আমাদের সামনে এখন সারারাত্রিটাই পড়ে রয়েছে।

ঘণ্টা আড়াই পরে দূর থেকে বামনদের শহর আবছায়ার মতো দেখা গেল। শহরটা দেখেই বাঘা রেগে গরর-গরর করে উঠল, কিন্তু কুমার তখনই তার মাথায় এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললে, খবরদার বাঘা, চুপ করে থাক! বাঘা একেবারে চুপ হয়ে গেল, তারপর একবারও সে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলে না। আশ্চর্য কুকুর।

শহরের ভিতরে মাঝে মাঝে আলো দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু জনপ্রাণীর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বামনরা বোধহয় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আচম্বিতে বিমল ও কুমার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি বললুম, ব্যাপার কী?

বিমল সামনের দিকে আঙুল তুলে দেখালে।

তা-ই তো, প্রকাণ্ড একটা ছায়ার মতো, অনেকখানি জায়গা জুড়ে কী ওটা পড়ে রয়েছে?

বিমল চুপিচুপি বললে, বিনয়বাবু, উড়োজাহাজ!

কুমার বললে, বোধহয় এইখানাই আমাদের পৃথিবীতে গিয়েছিল।

আমি বললুম, হুঁ, এর আকার দেখে তা-ই মনে হচ্ছে বটে। এখানা নিশ্চয় পৃথিবী আক্রমণ করতে যাবে বলে বিশেষভাবে তৈরি হয়েছিল, কারণ মঙ্গলের আর যত উড়োজাহাজ দেখেছি সবই ছোটো ছোটো। কিন্তু এখানা এমন খোলা জায়গায় পড়ে কেন?

বিমল বললে, বোধহয় শহরের ভিতরে এত বড়ো উড়োজাহাজ রাখবার জায়গা নেই।

বিমলের অনুমান সত্য বলেই মনে হল। আমি নীরবে ভাবতে লাগলুম।

বিমল বললে, এখন আমাদের কী করা কর্তব্য?

ধাঁ করে আমার মাথায় এক ফন্দি জুটে গেল।—এর আগে এমন ফন্দি আমার মাথায় ঢোকেনি কেন, পরে তা-ই ভেবে আমি নিজের বুদ্ধিকে যথেষ্ট ধিক্কার দিয়েছি, কারণ তাহলে আজ আমাদের মঙ্গল গ্রহে হয়তো আসতেই হত না। আমি বিমলকে বললুম, দ্যাখো, এই উড়োজাহাজখানা আমরা যদি আক্রমণ করি তাহলে কী হয়?

বিমল বললে, এ প্রস্তাব মন্দ নয়। উড়োজাহাজের ভিতরে হয়তো অনেক রসদ আছে। তাতে আমাদের পেটের ভাবনা দূর হতে পারে।

আমি বললুম, কিন্তু খুব চুপিচুপি কাজ সারতে হবে। কারণ শহরের লোক জানতে পারলে আমাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠবে।

বিমল বললে, দাঁড়ান, আগে আমি দেখে আসি।

বিমল হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। আমরা স্তব্ধ হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

খানিক পরে বিমল ফিরে এসে বললে, আক্রমণের কোনো বাধা নেই। উড়োজাহাজের

প্রধান দরজাটা খোলা রয়েছে। সিঁড়ির উপরে বসে একজন বামন-সেপাই ঢুলছে, আমি এখনই এমনভাবে চেপে ধরব, যাতে সে কোনো গোলমাল করতে পারবে না। আপনারা চুপিচুপি আমার পিছনে আসুন।

বিমল আবার হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হল, আমরা সকলেও ঠিক সেইভাবেই তার পিছু নিলুম।

খানিক দূর অগ্রসর হয়েই দেখলুম, উড়োজাহাজের ভিতর থেকে খোলা দরজা দিয়ে একটা আলোর রেখা বাইরে এসে পড়েছে। দরজার তলাতেই নীচে নামবার জন্যে সিঁড়ি, ঠিক তার উপর-ধাপে পা ঝুলিয়ে এবং উড়োজাহাজের গায়ে ঠেসান দিয়ে বসে আছে এক বামন-সেপাই।

আমাদের অপেক্ষা করতে বলে বিমল বুকে হেঁটে আরও খানিক এগিয়ে গেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চোখের পলক ফেলতে-না ফেলতে মারলে এক লাফ এবং সিঁড়ি টপকে পড়ল গিয়ে একেবারে সেই বামন-সেপাইয়ের বুকের উপরে। তারপর কী হল তা জানি না, কিন্তু বামনটার মুখ থেকে কোনোরকম আর্তনাদই আমাদের কানে বাজল না। অল্পক্ষণ পরেই বিমল উঠে দাঁড়াল এবং হাতছানি দিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে বললে।

তেইশ

জয়, জয়, জয়

বামনদের বাগে আনতে আমাদের বেশি বেগ পেতে হল না। একেই তো তারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল, তার উপরে তারা অস্ত্র ধরবার সময় পর্যন্ত পেলে না। অস্ত্রগুলো আমরা আগেই কেড়ে নিলুম, তারপর তাদের সবাইকে ভেড়ার পালের মতো তাড়িয়ে একটা ঘরের ভিতরে পুরে ফেললুম এবং ইশারায় জানিয়ে দিলুম যে, দুষ্টুমি করলে তারা কেউ প্রাণে বাঁচবে না।

বামনদের দলে লোক ছিল মোট আশিজন। মানুষের তুলনায় তারা এত দুর্বল যে, আমরা ইচ্ছা করলেই তাদের সবাইকে টিপে মেরে ফেলতে পারতুম।

একটা বামন চেঁচিয়ে গোলমাল করে উঠেছিল। কিন্তু কুমার তখনই তাকে খেলার পুতুলের মতো মাটি থেকে তুলে মারলে এক আছাড়। তাকে হত্যা করবার ইচ্ছা কুমারের মোটেই ছিল না, কিন্তু সেই এক আছাড়েই বেচারির ভবের লীলাখেলা সাঙ্গ হয়ে গেল একেবারে। লঘু পাপে গুরু দণ্ড।

আমরা দুঃখিত হলুম, কিন্তু হাতে হাতে এই কঠোর শাস্তি দেখে অন্য বামনরা দস্তুরমতো টিট হয়ে গেল—সবাই বোবার মতো চুপ করে রইল।

বিমল বললে, বিনয়বাবু, এইবারে এদের ভাঁড়ারঘরে ঢুকে রসদ—সব যা আছে, লুটপাট করে নেওয়া যাক।

আমি বললুম, না, এইবারে আবার পৃথিবীর দিকে যাত্রা করা যাক।

বিমল, কুমার ও কমল একসঙ্গে বললে, পৃথিবীর দিকে যাত্রা।

রামহরি এত আশ্চর্য হয়ে গেল যে, প্রকাণ্ড হাঁ করে আমার মুখের পানে শুধু তাকিয়ে

টীকা

প্রথম প্রকাশ

মৌচাক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ (জুলাই ১৯২৫ খ্রিঃ) থেকে আষাঢ় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে (জুন ১৯২৬ খ্রিঃ)। পুস্তকাকারে ১ম প্রকাশ এন এম রায়চৌধুরী অ্যান্ড কোং, কলকাতা থেকে শ্রাবণ ১৩৪০ অর্থাৎ জুলাই ১৯৩৩ খ্রিঃ। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, কলকাতা থেকে প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ জুলাই ১৯৬৬ খ্রিঃ। এশিয়ার *রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৪-৩৬৯।

বিষয়বস্তু

মঙ্গল গ্রহের প্রাণীদের পৃথিবী আক্রমণ এবং একাধিক পার্থিব জিনিস—একদল বানর-সমেত বট গাছ, পুকুরের সমস্ত জল এবং সেই জলের মাছ, খালাসি-সমেত স্টিমার, রেলগাড়ি—এবং উপন্যাসের মুখ্য কুশীলবদের অপহরণ করে মঙ্গলে আনয়ন। সেখানে কিছুদিন বসবাসের পর কৌশলে কুশীলবদের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মঙ্গল সম্বন্ধে প্রচলিত ধ্যানধারণা

সে সময়ের অনেক বিজ্ঞানী, যেমন ফ্রান্সের Nicolas Camille Flammarion (১৮৪২-১৯২৫), আমেরিকার Percival Lowell (১৮৫৫-১৯১৬), বা ওই দেশেরই William Henry Pickering (১৮৫৮-১৯২৩) বিশ্বাস করতেন যে মঙ্গলে পৃথিবীর চেয়ে প্রাচীন এবং উন্নততর কোনো সভ্যতা আছে। ১৮৭৭-এ ইটালির Giovanni Schiaparelli (১৮৩৫-১৯১০) দাবি করেন যে তিনি মঙ্গলের পৃষ্ঠতলে আড়াআড়িভবে একাধিক খাল দেখেছেন, যেগুলি গ্রহের অন্ধকার স্থানসমূহকে—তাঁর মতে এই এলাকাগুলি আদতে সমুদ্র—যুক্ত করছে। খাল যদি থাকে, কেউ সেগুলি নিশ্চয়ই কেটেছে! অতএব মঙ্গল গ্রহে প্রাণ আছে! পরে শিয়াপারেলি বলেন যে খালের সংখ্যা ১১৩। এই নামগুলির মধ্যে Pickering বাদে বাকিগুলি, পরের অনুচ্ছেদের Flammarion সমেত, উপন্যাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদের শেষে পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে।

এরপর, ১৮৮০-তে Flammarion *Kansas City Review of Science*-এ 'Mars inhabited, like our own earth' শীর্ষক প্রবন্ধে দাবি করেন যে (ক) মঙ্গলে দুটি তুষারাবৃত মেরু আছে, (খ) সমুদ্র আর স্থলভাগের অংশভাগ ঠিক আধাআধি, (গ) সুদীর্ঘ

খালসমূহ স্থায়ী জলাশয়গুলি সংযুক্ত করেছে, (ঘ) মঙ্গলের আবহাওয়া, লাল গাছপালা ও উদ্ভিদসমূহ এবং মসৃণ মেঘমালা প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে সহায়ক (ঙ) মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে অনেক কম হওয়ায় মঙ্গলের অধিবাসীরা আমাদের চেয়ে আকৃতিতে ভিন্ন আর উড়তে সক্ষম। (উপন্যাসের সপ্তদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য, যেখানে বিমলের লাফ দেওয়ার ফল কী হচ্ছে, দেখানো হয়েছে।)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে ১৯০৮-এর মধ্যে Lowell তিনটি মঙ্গল-সংক্রান্ত বইতে দাবি করেন যে গ্রহটিতে খালের সংখ্যা ৪৩৭, যেগুলির মাধ্যমে মেরুপ্রদেশের জল এনে গ্রহের বিষুবরেখা অঞ্চলের শুষ্ক এলাকায় সেচের কাজ করা হয়।

১৯০৩ থেকে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকার বিজ্ঞানীরা কিন্তু খালের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকেন। ১৯১০-এর পর ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের ষাট ইঞ্চি প্রতিফলক টেলিস্কোপ ব্যবহার করে অধ্যাপক George Ellery Hale (১৮৬৮-১৯৩৮) মঙ্গলের পৃষ্ঠতলের সুস্পষ্ট ছবি তুলে দেখান যে কোনো খালেরই অস্তিত্ব সেখানে নেই।

কল্পকাহিনিতে মঙ্গল গ্রহ ও তার অধিবাসীরা

কল্পকাহিনিতে মঙ্গলের বাসিন্দাদের মূলত তিনটি ভিন্নভাবে দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকটির উদাহরণ দেওয়া হল :

(ক) তারা মানুষের চেয়ে উন্নত : Kurt Lassiwitz-এর ১৮৯৭-এর উপন্যাস *Auf zwei Planeten* (দুই গ্রহে)-এ মাঙ্গলিকেরা তাদের উন্নততর জ্ঞান পৃথিবীতে বিতরণ করতে এসে ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে এখানে থেকে যায়।

(খ) তাদের সভ্যতা অবক্ষয়ী : ১৯০৫ সালে প্রকাশিত Edwin Lester Arnold-এর *Lieut. Gullivar Jones : His Vacation* উপন্যাসের প্রভাব পড়ে পরবর্তীকালে টারজান-স্রষ্টা Edgar Rice Burroughs-এর Barsoom উপন্যাসসমূহের ওপর, যার প্রথম বই প্রকাশ পায় ১৯১২-তে : *A Princess of Mars*।

(গ) তারা আগ্রাসী এবং অশুভের প্রতীক : H.G. Wells-এর ১৮৯৭ সালের উপন্যাস *The War of the Worlds* থেকে হেমেন্দ্রকুমার এই ধারাটিই নিয়েছেন। তবে, ওয়েল্‌সের থেকে তাঁর আখ্যান অনেকটাই ভিন্ন। প্রথমে কল্পবিশ্ব পত্রিকায় প্রকাশিত, এবং পরে কল্পবিশ্ব থেকে প্রকাশিত আমার *হেমেন্দ্রকুমার রায় : এক পথিকৃতের কীর্তিকাহিনি* বইতে সংকলিত এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য খানিকটা পরিবর্ধন করে এখানে দিলাম :

The War of the Worlds উপন্যাসে মঙ্গল গ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীকে তাদের উপনিবেশ বানাতে চেয়েছিল। ভিন গ্রহের আক্রমণ নিয়ে এটিই সম্ভবত বিশ্বসাহিত্যে প্রথম কাহিনি। ওয়েল্‌স সাহেব তাঁর উপন্যাসের নামে যে war-এর কথা বলেছেন, সেটির ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে আমাদের পৃথিবী। মাঙ্গলিকেরা যেভাবে অবলীলায় ইংল্যান্ডের Woking গ্রাম থেকে শুরু করে সে সময়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শহর বলে খ্যাত লন্ডনকে ছারখার করেছে, তার মধ্য দিয়ে লেখক